



মা, তোর বদনখানি মলিন হলে...

বছর দুয়েক আগের কথা, আমি একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছি। বাংলাদেশের যে কয়টি সংগঠন আছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংগঠনগুলোর একটি—তাদের বিশাল আয়োজন (সংগঠনটিকে প্রকাশ্যে লজ্জা দিতে চাই না বলে নাম উল্লেখ করলাম না)। অনুষ্ঠান শুরু হবে জাতীয় সংগীত দিয়ে, তাই মঞ্চের কয়েকজন উঠেছেন সেটি গাওয়ার জন্য। আমরা দর্শকেরা উঠে দাঁড়িয়েছি। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর সংগীতটি গাওয়া শুরু হলো এবং দুই লাইন গাওয়ার পরই আমি বুঝতে পারলাম, মঞ্চের যারা গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তারা কেউ দেশের জাতীয় সংগীতটি জানে না। সবাই ধরে নিয়েছে, অন্য একজন জানে এবং তার সঙ্গে গলা মেলাবে, কিন্তু ঘটনাক্রমে একজনও গানের কথাগুলো জানে না। মঞ্চের দাঁড়িয়ে সেই গায়কেরা কতটুকু লজ্জা পেয়েছে আমি জানি না, কিন্তু আমি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে গেলাম। শুধু লজ্জা নয়, আমি ভয়ংকর একটি ধাক্কা খেলাম— তাহলে কি আমাদের দেশে একটি তরুণ প্রজন্ম বড় হচ্ছে, যারা দেশের জাতীয় সংগীতটি জানে না?

শুধু তরুণ প্রজন্ম নয়, আমার ধারণা, আমাদের অনেক বড় মানুষও জাতীয় সংগীতটি জানেন না। তার একটা রাষ্ট্রীয় প্রমাণ পেয়েছিলাম জোট সরকারের আমলে ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের ৪৯তম সম্মেলনের শুরুতে জাতীয় সংগীতটি শুরু না হতেই থেমে গিয়েছিল।

একাধিকবার চেষ্টা করেও যখন সেটি বাজানো সম্ভব হয়নি, তখন সে সময়কার প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া একজন সাংসদকে সেটা গাইতে বলেছিলেন। সেই সাংসদ পুরোটুকু জানতেন না, একটুখানি গেয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। যদি সবাই পুরো জাতীয় সংগীতটুকু সঠিকভাবে গাইতে পারত,

তাহলে এই যান্ত্রিক গোলাযোগটাই একটা মধুর ব্যাপার হতে পারত । প্রধানমন্ত্রী সবাইকে বলতে পারতেন, ‘আসুন, আমরা সবাই মিলে জাতীয় সংগীত গেয়ে ফেলি ।’ মঞ্চে দাঁড়িয়ে সবাই মিলে মাথা দুলিয়ে গলা ফাটিয়ে জাতীয় সংগীত গাইত পারতেন— হয়তো একটু বেসুরোভাবেই, কিন্তু আমাদের জাতীয় সংগীতের কথাগুলো এত সুন্দর যে বেসুরো হলেই কী এমন ক্ষতি হতো? কিন্তু সেটা হয়নি, পৃথিবীর ৪৬টা দেশের সামনে আমরা নিজেদের বেইজ্জতি করে ছেড়েছিলাম (সেই সম্মেলনের অবশিষ্ট আরও অনেক ইতিহাস আছে, অনেক দেশের জাতীয় পাতাকাও উল্টো করে টাঙানো হয়েছিল, সেই দেশের প্রতিনিধির অনেকে নিজেরা তাঁদের পতাকা নামিয়ে সোজা করে নিয়েছিলেন!) ।

আমি যখন টের পেয়েছি যে একটা আশঙ্কা আছে, আমাদের স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা সবাই সঠিকভাবে জাতীয় সংগীত গাইতে পারে না, তখন থেকে কোনো অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত গাওয়া হলেই আমি তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করি, কতজন গাইছে । আমি লক্ষ্য করেছি, খুব কমসংখ্যক ছেলেমেয়ে কণ্ঠ দেয় । তারা জাতীয় সংগীতটি জানে না, সে জন্য গাইছে না, নাকি সবার সঙ্গে গাওয়ার প্রয়োজন আছে সেটি অনুভব করে না— সেটি কখনো নিশ্চিত হতে পারিনি ।

এ রকম সময়ে আমাদের স্কুলের পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধ-সংক্রান্ত যেসব বিকৃতি আছে, সেগুলো সংশোধন করার জন্য একটা কমিটি করা হলো এবং ঘটনাক্রমে সেখানে আমাকেও রাখা হয়েছে । সবাই মিলে যখন বিকৃতিগুলো সংশোধন করছি, তখন আমি আবিষ্কার করলাম, প্রাইমারি স্কুলের বাংলা বইয়ের শুরুতেই আমাদের জাতীয় সংগীতটি দেওয়া হয়েছে । একটি ছোট বাচ্চার জন্য জাতীয় সংগীতটি শিখে ফেলার এটাই হচ্ছে মোক্ষম সময়— কাজেই এটা খুবই বুদ্ধিমানের কাজ । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার আরও একটি বিষয় মনে হলো— আমাদের সংবিধানে জাতীয় সংগীতের জায়গায় লেখা আছে ‘প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সংগীত আমার সোনার বাংলা-র প্রথম দশ চরণ’ এবং পাঠ্যবইয়ে সেই দশ লাইন তুলে দেওয়া আছে । কিন্তু সংগীতটি যখন গাওয়া হয়, তখন কিন্তু হুবহু এভাবে গাওয়া হয় না । কোনো লাইন বা লাইনের অংশ দ্বিতীয়বার গাওয়া হয়, কোনো লাইন মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে আবার শুরু করা হয় এবং যারা গায়ক বা গায়িকা, তারা সেগুলো জানেন— আমাদের মতো সাধারণ মানুষ সেগুলো জানি না । কাজেই আমার মনে হলো, আমাদের ছেলেমেয়েদের সংবিধানে উল্লেখ করা জাতীয় সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে গাওয়া হয়, সেটাও জানিয়ে দেওয়া উচিত । মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি সংশোধন কমিটির অন্য সদস্যদের

কাছে আমি যখন সেই প্রস্তাবটি করেছি, তখন তাঁরা সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন। তাই গত দুই বছরের প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্যবইয়ে আমাদের জাতীয় সংগীতের নিচে নতুন একটি বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে, ‘গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণ পাঠ’। সেটি আমি এই লেখার সঙ্গে যুক্ত করে দিচ্ছি। আমার ইচ্ছা, যাঁরা এখনো আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির জাতীয় সংগীতটি (যেটি পৃথিবীর মধুরতম একটি সংগীত) জানেন না, তারা এই অংশটি কেটে তাঁদের পকেটে বা ব্যাগে রাখবেন। প্রতিদিন সময় করে এক-দুইবার করে পড়বেন, দেখতে দেখতে তাঁরা আমাদের জাতীয় সংগীতটি ঠিক যেভাবে গাওয়ার কথা, সেটি তাঁরা শিখে যাবেন।

কথাগুলো শিখে যাওয়ার পর বাকি থাকল সুর। এ ব্যাপারে আমি একেবারে অজ্ঞ, আমার যে গলায় কোনো সুর নেই, শুধু তা-ই নয়, আমার কানেও কোনো সুর নেই। আমার সংগীতজ্ঞ বন্ধুরা যখন সুরের সুস্বর তারতম্য নিয়ে কথা বলেন, তখন আমি একধরনের বিস্ময় নিয়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকি! ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটি একসময় ছিল শুধু একটি রবীন্দ্রসংগীত, যখন সেটাকে আমরা আমাদের জাতীয় সংগীত হিসেবে ঠিক করেছি, তখন সেটি শুধু গায়ক-গায়িকাদের জন্য থাকেনি—আমাদের সবার জন্য হয়ে গেছে। এখন এটি শুধু অল্প কিছু গায়ক-গায়িকা গাইবেন না, এ দেশের ছেলে-বুড়ো, পুরুষ-মহিলা, সাংসদ-মন্ত্রী, পুলিশ-মিলিটারি—সবাই গাইবে। যার গলায় সুর আছে সে যে রকম গাইবে, ঠিক সে রকম যার গলায় সুর নেই সেও গাইবে। তাই এর সুরটিকে সহজ করে নেওয়া হয়েছিল।

আমি ইন্টারনেটে বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত জাতীয় সংগীত খুঁজেছি, সঠিকভাবে খোঁজা হয়েছে কি না জানি না, তবে খুঁজে পাইনি। আমার গায়ক বন্ধুরা আমাকে বলেছেন, বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত জাতীয় সংগীতের যন্ত্রসংগীত রূপ আছে, তবে মূল গানটি নেই। আমার বিশ্বাস হতে চায় না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না, এ রকম অনেক কিছুই পৃথিবীতে আছে, তাই আমার নিজের বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে খুব বেশি গুরুত্ব দিই না। ইন্টারনেটের ইউটিউবে যন্ত্রসংগীত এবং জাতীয় সংগীত দুটি-ই খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু সেটি কোনো একজনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রীয় কিছু নয়। আমার গায়ক বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে আমি ছায়ানটের একটি সিডির সন্ধান পেয়েছি, যেটিতে লেখা আছে, ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সুর’—আমার মনে হয়, সেটাকেই রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশের মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত।

কিছুদিন আগে ‘জাগরণের গান’ হিসেবে বেশ কটি দেশাত্মবোধক গান প্রকাশ করা হয়েছে, এর প্রথমটিতেও আমাদের জাতীয় সংগীত আছে— যেটি এখন ইচ্ছে করলেই সংগ্রহ করা যায়।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় সংগীত গায়— আমি আবিষ্কার করেছি, তাদের গলায় অপূর্ব সুর, কিন্তু কথাগুলো সঠিক নয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, আমি তাদের কাছে ‘গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণ পাঠ’ ধরিয়ে দেওয়ার পরও তারা নিজেদের মতো করে জাতীয় সংগীতটি গাইতে পছন্দ করে। যার অর্থ, তারা যেখান থেকে শিখে এসেছে, সেখানেই অনেক যত্ন করে তাদেরকে এভাবে শেখানো হয়েছে— তারা চেষ্টা করেও তার বাইরে যেতে পারে না। আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রজ্ঞাপনে স্পষ্ট করে লেখা আছে, সাধারণ মানুষের অনুষ্ঠানে যখনই জাতীয় সংগীত গাওয়া হবে, তখন পুরোটুকু গাইতে হবে। তার পরও দেখি, অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অর্ধেক গেয়ে শেষ করে দেওয়া হয়। খুব সহজ ভাষায় বলা যায়, স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও জাতীয় সংগীত নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম আছে। আমার ধারণা এটা ঠিক করা দরকার।

আমি যখন ক্লাস থ্রি-ফোরের ছাত্র, তখন আমাদের স্কুলে কিছু মানুষ এসে স্কুলের ছাত্র আর শিক্ষকদের পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। দুর্বোধ্য ভাষার সেই জাতীয় সংগীতটি আমাদের প্রতিদিন গাইতে হতো এবং সেটি এক সময় আমাদের মস্তিষ্কে পাকাপাকিভাবে স্থান করে নিয়েছিল। একান্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে আমার খুব খারাপ লাগত যে পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতটি আমার মস্তিষ্কে জায়গা দখল করে বসে আছে এবং চেষ্টা করেও আমি সেটা আমার মাথা থেকে সরাতে পারি না— আমি সেটা ভুলে যেতে পারি না! তবে খুবই আনন্দের ব্যাপার, ইদানীং আমি পরীক্ষা করে দেখছি, ছেলেবেলায় শেখা অনেক কবিতা আমার মুখস্থ আছে, কিন্তু পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত ‘পাক সার জমিন সাদ বাদ’ আমার মস্তিষ্ক থেকে বিদায় নিয়েছে— আমি চেষ্টা করেও এখন সেটা মনে করতে পারি না।

তবে এ ঘটনা থেকে আমি একটি জিনিস বুঝতে পেরেছি, একটা ছোট শিশুকে শিশু অবস্থায় জাতীয় সংগীত শিখিয়ে দেওয়া হলে সারা জীবন সে সেটি মনে রাখবে। কাজেই আমাদের রাষ্ট্রের দায়িত্ব, প্রতিটি স্কুলের এক-দুজন শিক্ষককে সঠিক কথা আর সুরে জাতীয় সংগীতটি শিখিয়ে দেওয়া এবং তাদের

ওপর দায়িত্ব দেওয়া, স্কুলের সব ছাত্রছাত্রীকে প্রতিদিন সেটি গেয়ে তাদের দিনটি শুরু করানো। দেশের বড় করপোরেশনগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কিছু কাজ করার কথা— তারাও সাহায্য করতে পারে।

আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটি শুধু একটি গান— আমাদের কাছে সেটি আরও অনেক কিছু। ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি মিলিটারি পৃথিবীর ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিল— পরদিন সারা পৃথিবীর রেডিওতে সেই খবরটি প্রচারিত হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা থেকে পরদিন এই খবরটি প্রচার করেছিল খুব সংক্ষিপ্তভাবে দুই-এক লাইনে— তারপর ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটি প্রচার করেছিল। একবার-দুইবার নয়, অসংখ্যবার। সেই গানের কথা ও সুর আমাদের রক্তের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল— আমরা তখন কেউ জানতাম না, কত রক্ত দিয়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতাটুকু অর্জন করতে পারব। আমাদের প্রজন্মের কাছে এই জাতীয় সংগীতটি শুধু একটি সংগীত নয়— এটি অনেক কিছু। এখন পর্যন্ত একবারও হয়নি, যখন কেউ এই গানটি গেয়েছে এবং তার কথাগুলো শুনে আমার চোখ ভিজে আসেনি।

২.

ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ আমি দুই চোখে দেখতে পারি না। কিন্তু ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ আমার অসম্ভব প্রিয়। কেউ যেন মনে না করে, আমি একজন খাঁটি বোদ্ধা। ফুটবল শারীরিক খেলা, একজন খেলোয়ার ক্রমাগত আরেকজন খেলোয়াড়ের গায়ে গা লাগিয়ে ছটোপুটি করেন বলে আমার ‘সুকুমার’ মনোবৃত্তি আহত হয়— তাই এই খেলাটি আমি দেখতে পারি না। সেই তুলনায় ক্রিকেট ভদ্র মানুষের খেলা, একজন খেলোয়াড় আরেকজন খেলোয়াড়কে স্পর্শ না করে খেলে যান, তাই আমি খেলাটি পছন্দ করি— আসলে সে রকম কিছু নয়। ফুটবলের ওয়ার্ল্ড কাপ আমি দুই চোখে দেখতে পারি না, কারণ সেই সময়টাতে আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম দেশটাতে বিদেশের পতাকা আকাশে উড়তে থাকে এবং দেখে মনে হয়, পুরো দেশটাকে বুঝি বিদেশিরা দখল করে ফেলেছে। জাতীয় পতাকা মোটেও এক টুকরো কাপড় নয়— এটা অনেক বড় রাষ্ট্রীয় ব্যাপার, ইচ্ছে করলেই একটা দেশে অন্য দেশের পতাকা তোলা যায় না। বিশেষ প্রয়োজনে যদি অন্য দেশের পতাকা তুলতে হয়, তাহলে তার আগে অনেক নিয়মকানুন মানতে হয়—

অন্য দেশের পতাকা থেকে উঁচুতে নিজের দেশের পতাকাটি টাঙাতে হয়। আমি দেখেছি, আমাদের রাষ্ট্র সে কথাগুলো কাউকে মনে করিয়ে দেয় না। দেশের মানুষ পুরোপুরি নির্বোধের মতো নিজের দেশকে অপমান করতে থাকে, কেউ সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

আমি ক্রিকেটের ওয়ার্ল্ড কাপ অসম্ভব ভালোবাসি, কারণ এই সময়টাতে সারা দেশের মানুষ লাল-সবুজের রঙের খেলায় মেতে ওঠে। এই খেলায় আমার নিজের দেশ খেলছে এবং আমরা ক্রমাগত ‘বাংলাদেশ’, ‘বাংলাদেশ’ করে চিৎকার করছি। দেশকে ভালোবাসার আর দেশকে নিয়ে গর্ব করার একটা সুযোগ করে দেয় এই ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট খেলা। যারা ক্রিকেট বোদ্ধা, তাঁরা খেলার প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেন, আমি পারি না। আমি খেলা দেখতে পারি, যখন সেই খেলায় বাংলাদেশ জিততে থাকে, শুধু তখন! বাংলাদেশ যদি কখনো কোনো খেলায় হেরে যায়, তখন দুঃখে আমার বুক ভেঙে যায়, মনে হয় হাউমাউ করে কাঁদি।

এই দেশের মানুষেরা আজকাল লাল-সবুজ রঙের কাপড় পরে, মাথায় ফেটি বাঁধে। লাল-সবুজ আমাদের জাতীয় পতাকার রং। মার্চ মাস আসছে, আমাদের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অসংখ্য জাতীয় পতাকা তৈরি হবে এবং আকাশে ওড়ানো হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার’ বলে লাইব্রেরিতে একটি অংশকে আলাদা করে রাখা হয়েছে, যেখানে মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রকাশিত যত বই, যত তথ্য সবকিছু সংগ্রহ করা হচ্ছে। তার দেয়ালে ঝোলানোর জন্য আমি সবচেয়ে বড় জাতীয় পতাকাটি কিনে এনেছিলাম। সেটি ঝোলানোর সময় মেপে আমি আবিষ্কার করলাম, সেটি সঠিক মাপে তৈরি নয়। পুরোটি কেটে আমাকে নতুন করে জাতীয় পতাকা তৈরি করতে হয়েছে। এখন আমি চোখ খোলা রেখে তাকাই এবং একধরনের দুঃখ মেশানো বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করি যে বাংলাদেশ জাতীয় পতাকা নিয়েও একধরনের বিশৃঙ্খলা চলছে। যে কেউ যেকোনো মাপে জাতীয় পতাকা তৈরি করে বাজারে বিক্রি করছে, কেউ তাকে থামাচ্ছে না। জাতীয় পতাকার লাল-সবুজ রংটি সঠিক—এ ছাড়া আর কিছু সঠিক নয়। একটি সবুজ আয়তক্ষেত্রে মোটামুটি আকারের একটা লাল বৃত্ত বসিয়ে দিলেই সেটা জাতীয় পতাকা হয়ে যায় না। কিন্তু সেটাই এ দেশে ঘটছে।

অথচ জাতীয় পতাকার মাপটি মোটেও কঠিন নয়। দশ এবং ছয় এই দুটি সংখ্যা মনে রাখলেই জাতীয় পতাকার পুরো মাপটি মনে রাখা সম্ভব। জাতীয়

পতাকার দৈর্ঘ্য যদি দশ ফুট হয়, তাহলে তার প্রস্থ হবে ছয় ফুট। এখন আমার জানা দরকার, লাল বৃত্তের সাইজ, দশ থেকে ছয় বিয়োগ দিলেই সেটা বের হয়ে যাবে, অর্থাৎ বৃত্তের ব্যাস হচ্ছে চার ফুট। বৃত্তটি যদি আয়তক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে বসানো হতো, তাহলে আর কিছুই জানতে হতো না— কিন্তু আমাদের জাতীয় পতাকার লাল বৃত্তটি পতাকা টাঙানোর দণ্ডটির দিকে একটু সরে এসেছে। কতটুকু সরে এসেছে, সেটা অনেকভাবে বের করা যায়, সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি এ রকম। বাঁ- দিকে পতাকার খুঁটি থাকলে ডান দিকে এক ফুট কাপড় ভাঁজ করে আয়তক্ষেত্রটি নয় ফুট বাই ছয় ফুট করে ফেলতে হবে। এখন বৃত্তটি বসাতে হবে এই নয় ফুট বাই ছয় ফুট আয়তক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে। দশ ফুট বাই ছয় ফুট সাইজের জাতীয় পতাকা না করে কেউ যদি পাঁচ ফুট বাই তিন ফুট বা আরও ছোট করতে চায়, তাহলে ঠিক একই মাপে সবকিছু কমিয়ে আনতে হবে।

আমার ইচ্ছা, রাষ্ট্র এই বিষয়গুলোতে একটুখানি নজর দিক। যে ফেরিওয়ালা জাতীয় পতাকা বিক্রি করছে, তাকে বাধ্য করুক সঠিক মাপের জাতীয় পতাকা তৈরি করতে। স্কুলের বাচ্চাদের উৎসাহ দিক লাল-সবুজ কাগজ কেটে সঠিক মাপের জাতীয় পতাকা তৈরি করতে। একটি দেশ স্বাধীন হওয়ার চল্লিশ বছর পরও আমরা সঠিক জাতীয় পতাকা খুঁজে পাব না— এটা হতে পারে না।

জাতীয় পতাকা নিয়ে আমাদের একটা চমৎকার বিষয় আছে, যেটা অন্য দেশগুলোর নেই। সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন জাতীয় পতাকা। সেই পতাকার মাঝখানে সোনালি রং দিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্রটি বসানো ছিল। প্রথম দিন যখন আমি এই মানচিত্র দেখেছিলাম, তখন আমার বুকের ভেতর যেভাবে রক্ত ছাড়া করে উঠেছিল, আমি এখনো সেটি অনুভব করতে পারি। মুক্তিযুদ্ধের সেই পতাকাটি একটু পরিবর্তন করে এখন আমরা আমাদের নতুন জাতীয় পতাকা পেয়েছি— কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সেই পতাকাটি কিন্তু হারিয়ে যায়নি। আমরা কিন্তু সেই পতাকাটিকে আমাদের হৃদয়ের ভেতরে স্থান করে দিয়েছি। আমার খুব ভালো লাগে যখন দেখি, তরুণ প্রজন্ম এখনো মুক্তিযুদ্ধের পতাকাটিও সমান মমতায় নিজের কাছে রাখছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধ কর্নারে জাতীয় পতাকার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের পতাকাটিও আমরা গভীর মমতায় বুলিয়ে রেখেছি।

গাড়িতে পতাকা লাগানোর একটি ব্যাপারে আছে— শুধু মন্ত্রীরা গাড়িতে

পতাকা লাগাতে পারেন। এই বিষয়টি আমি ভালো বুঝতে পারি না। জাতীয় সংগীত এবং জাতীয় পতাকার ওপরে দেশের জনগনের সবার একধরনের অধিকার আছে। জাতীয় পতাকাটিকে যথাযথ সম্মান দেখানো হলে যে কোনো মানুষের সেটি ব্যবহার করার অধিকার থাকার কথা ছিল। বিজয় দিবস কিংবা স্বাধীনতা দিবসে অনেকেই গাড়িতে জাতীয় পতাকা লাগিয়ে নেন, আমি দেখেছি, পুলিশ তাদের থামিয়ে পতাকা খুলে ফেলতে বাধ্য করেছে! মুক্তিযুদ্ধের পতাকাটি লাগালে নিশ্চয়ই পুলিশ কিছু বলতে পারবে না।

৩.

আমাদের জাতীয় জীবনে একটি চরম লজ্জা, দুঃখ, অপমান, ক্ষোভ, ক্রোধ ও বেদনার ইতিহাস আছে। সেটি হচ্ছে, জোট সরকারের আমলে পূর্ব পাকিস্তান আলবদর বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মতিউর রহমান নিজামী এবং পূর্ব পাকিস্তান আলবদর বাহিনীর কেন্দ্রীয় সংগঠক আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের মন্ত্রী হয়ে যাওয়া। যারা এই দেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে, তারা সেই দেশের জাতীয় পতাকাটি তাদের গাড়িতে লাগিয়ে এই দেশের মাটিতে ঘুরে বেড়িয়েছে— আমরা বিস্ফারিত চোখে স্ট্রিট তাকিয়ে দেখেছি। আমার মাতৃভূমির এর চেয়ে বড় অপমান আর কখনো হয়নি। ‘আমার সোনার বাংলা’ গানের কথা দিয়ে এই দেশের সব মানুষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, ‘মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, / ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি’!

আমার মায়ের বদনখানি মলিন হয়েছে— যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে আমার মায়ের বদনে আবার হাসি ফোটাতে হবে। দেশের প্রতিটি মানুষ কিন্তু নিঃশ্বাস বন্ধ করে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

সরকারের সেটি মনে আছে তো?

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

ও মা, ফাগুনে তোর আমার বনে ছাণে পাগল করে,
মরি হয়, হয় রে-
ও মা, ফাগুনে তোর আমার বনে ছাণে পাগল করে,
ও মা, অন্ধানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হয়, হয় রে-
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥